কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ

বর্ষাকালীন শাক-সব্জী বাজারজাতকরণে সর্তকতা

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে শাক-সব্জীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিমানের বিচারে আমাদের দৈনিক খাদ্যের তালিকায় শাক-সব্জীর উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী। শাক-সব্জীতে আছে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ লবণ যা রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। তাই শাক-সব্জীকে অনেকে রোগ প্রতিরোধক খাদ্যও বলে থাকেন। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমানে শাক-সব্জী উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের শাক-সব্জীগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একটি রবি মৌসুম বা শীতকালীন, দ্বিতীয়টি খরিফ-১ মৌসুম বা গ্রীষ্মকালীন ও তৃতীয়টি খরিফ-২ মৌসুম বা বর্ষাকালীন ।

বর্ষাকালীন শাক-সব্জী :

বর্ষাকালে আমাদের দেশে যে সমস্ত শাক-সব্জী চাষ হয় সেগুলো হচ্ছে ডাটা, লালশাক, পুইশাক, মিষ্টিকুমড়া, শসা, চালকুমড়া, করলা, কাকরোল, বেগুন, লতি, পেঁপে ইত্যাদি।

বর্ষাকালে শাক–সব্জী চাষ :

শীতকালে বাজারে বিভিন্ন শাক-সব্জীর প্রচুর সমারোহ থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে তা অনেকটা কমে আসে। এ সময় বাড়ির আঙ্গিনায় সব্জীর চাষ করে সব্জীর প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যায়। বর্ষাকালীন সব্জীর মধ্যে কাকরোলের চাষ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

কাকরোল কুমড়া পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ষাকালীন সব্জী। কাকরোলের জন্য উষ্ণ ও আদ্র জলবায়ু প্রয়োজন। বন্যামুক্ত এবং পানি নিষ্কাষণের সুব্যবস্থা আছে এমন মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি কাকরোল চাষের জন্য উপযোগী। কাকরোলের জন্য দোআঁশ, এটেল দোআঁশ মাটি অথবা কিঞ্চিত অম্ল মাটি ভাল। কাকরোলের যে সমস্ত জাত আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আসামি, মনিপুরী, আলমী ও টেম্পু ইত্যাদি। চারা গাছ লাগানোর ৬০-৬৫ দিন থেকে শুরু করে ১৩০-১৫০ দিন পযর্ন্ত ফল পাওয়া যায়। কাকরোলের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যায় তবে সে চারা থেকে ভাল ফলন পাওয়া যায় না। কাকরোলের বংশ বিস্তারের জন্য সাধারণত কন্দমূল ব্যবহার করা হয় যা মোথা হিসেবে পরিচিত। বেড তৈরী করে চাষাবাদ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। কাকরোল গাছ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং অনেক সময় ব্যাপী ফল দিয়ে থাকে। কাজেই এ ফসলটির সফল চাষ করতে হলে গাছের জন্য পযার্প্ত সারের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তবে এ সব্জীটি চাষের জন্য অল্প পরিমানে সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের শারীরিক বৃদ্ধি, ফুল, ফল ধরা এবং ফলের বৃদ্ধির জন্য পযার্প্ত রসের প্রয়োজন হয়। ফল ধরার সময় পানির সামান্য অভাব হলে ফল ঝরে যাবে। অন্যদিকে কাকরোল গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কাকরোল গাছে মাচা দেয়া অত্যাবশ্যক। গাছ যখন ৫০ সেঃ মিঃ লম্বা হবে তখন ১.৫০ মিটার উঁচু মাচা দিতে হবে। সারিতে গাছ লাগানোর বেলায় বাঁশের খাড়া বেড়া

বাউনি হিসেবে উত্তম। কাকরোল যখন সবুজ হলদে হয় তখনই উত্তোলনের সময়। উপযুক্ত পরিচযা ও সঠিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করলে হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ টন ফলন পাওয়া যায়।

বষার্কালীন শাক-সব্জী বাজারজাতকরণে সতর্কতা :

আমাদের দেশে বষার্কালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তাই ফসল সংগ্রহের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে সঠিক সময়ে ফসল তোলা যায় এবং ফসলের গুনগত মানের যেন কোন ক্ষতি না হয়। সাধারণত খুব ভোরে এবং পড়ন্ত বিকেলে শাক-সব্জী সংগ্রহ করতে হবে। সব্জী ফসলের সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া সঠিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হলেই কৃষক যেমন ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবে তেমনি সাধারণ ভোক্তারাও উপকৃত হবে মান সম্মত খাবার খেয়ে। শাক-সব্জী সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করলে এর পুষ্টিমান বজায় থাকে। শাক-সব্জী সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও আদ্রতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ফসলের জন্য যেমন প্রজোয্য। যেমনঃ শসা, বেগুন, কাকরোল ইত্যাদি ফসল সংরক্ষণের জন্য ১০° তাপমাত্রা এবং ৮৫-৯৫% আর্দ্রতা প্রয়োজন।

শাক-সব্জীর পুষ্টিমান :

আমাদের শরীরকে সুস্থ সবল রাখতে যে সব খাদ্য উপাদানের দরকার সেগুলোর মধ্যে ভিটামিন ও খনিজ লবণ অন্যতম। আর এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রধান উৎস হল বিভিন্ন রকমের শাক-সব্জী। শাক-সব্জী আমাদের খাদ্যকে পুষ্টির দিক দিয়ে অধিকতর সুষম করতে সক্ষম। বিশেষ করে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের ঘাটতি পূরণে শাক-সব্জী প্রচুর অবদান রাখতে পারে। মানুষের দেহে খাদ্যের প্রধান কাজ প্রধানত তিনটি যথাঃ দেহের গঠন, ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি। একক কোন খাদ্য বস্তু দিয়ে এই তিনটি কাজ সমাধান করা যায় না। দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য বিভিন্ন রকমের খাদ্য খেতে হয়। শাক-সব্জী বাংলাদেশের মানুষের পুষ্টির উন্নতি ঘটিয়ে দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে পারে। এজন্য আমাদেরকে অধিক পরিমানে শাক-সব্জী খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নিয়মিত শাক-সব্জী খেলে কোষ্ঠ্য কাঠিন্য দেখা দেয় না। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন সঠিক পদ্ধতিতে ১০০ গ্রাম পত্রবহুল সব্জী খায় তবে তার দেহে খাদ্য প্রাণ ও খনিজ উপাদানের ঘাটতি থাকে না।

আনারস বাজারজাতকরণের কৌশল

আনারস একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও স্বল্পমেয়াদী ফল। আমাদের দেশে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাজা ফল হিসেবে আনারস খাওয়া হয়। তবে বিভিন্ন ধরণের প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার যেমন- জুস, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই আনারসের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাণিজ্যিক ফল হিসেবেও আন্তর্জাতিক বাজারে আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। আমাদের দেশের পার্বত্য জেলা এবং মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর এলাকায় কৃষকদের কাছে আনারস একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। অতীতে শুধুমাত্র বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

মাস থেকে শ্রাবণ-ভাদ্র মাস পর্যন্ত আনারস পাওয়া যেত। ইদানীং বাংলাদেশে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাগুলোতে বছরব্যাপী আনারস ফলানো সম্ভব হচ্ছে। আর এ কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী পণ্য হিসেবে বৈদেশীক মুদ্রা অর্জনে আনারস বিশেষ অবদান রাখছে। ফলে বাণিজ্যিক ফল হিসেবে আনারস কৃষকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় কৃষি পণ্যরূপে সমাদৃত হয়ে আসছে।

আনারসের পুষ্টিমান, ঔষধিগুণ ও ব্যবহার :

পাকাঁ ফল হিসেবে আনারস একটি অত্যন্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। আনারসের মোট ওজনের শতকরা ৬০ ভাগ খাওয়ার যোগ্য। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি ও সি। আমাদের দেশে আনারস সাধারণত তাজা পাঁকা ফল হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে উৎপাদিত আনারসের বেশিরভাগই প্রক্রিয়াজাত করা হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে আনারসের ফল অ্যালকোহল ও সাইট্রিক এসিড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আনারসের পাতা থেকে যে আঁশ উৎপন্ন হয় তা দিয়ে উৎকৃষ্ট মানের সুতা তৈরী হয়। তাছাড়া পাতা থেকে মোম তৈরী হয়। আনারস অনায়াসে আন্তঃফসল হিসেবে কমলা/নারিকেল/আম/কাঁঠালের সাথে চাষ করা যায়। আনারস-এর রসে ব্রোমিলিন নামক এক প্রকার জারক রস থাকে বলে আনারস পরিপাক কাজে সহায়ক। এ ছাড়া কচি ফলের শাঁস ও পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে সেবন করলে ক্রিমি দমনে সহায়ক হয়। আর প্রক্রিয়াজাতকৃত আনারস অর্থাৎ জ্যাম, জেলি, জুস খুবই উৎকৃষ্ট মানের খাবার।

আনারসের বিভিন্ন জাত ও উৎপাদন এলাকা :

পৃথিবীতে আনারসের অনেক জাত থাকলেও বাংলাদেশে হানি কুইন, জায়েন্ট কিউ ও ঘোড়াশাল এই তিন জাতের আনারস চাষ হয়ে থাকে। হানি কুইন জাতের আনারস পার্বত্য জেলাগুলোতে ও শ্রীমঙ্গলে এবং জায়েন্ট কিউ জাতের আনারস মধুপুর অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভাবে চাষ হয়ে থাকে। হানি কুইন জাতের আনারস অত্যন্ত সুমিষ্ট, কম আঁশযুক্ত, রসালো, আকারে ছোট, স্বাদ ও গন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট। অপরদিকে 'জায়েন্ট কিউ' জাতের ফল আকারে বড় ও ওজনে ভারী। তাই পাহাড়ের ঢালে 'হানি কুইন' জাতের আনারস ও সমতল ভূমিতে 'জায়েন্ট কিউ' জাতের আনারস চাষ করা উত্তম।

আনারস বাজারজাতকরণ :

আমাদের দেশে আনারস সাধারণত কেটে ছিলে সরাসরি খাওয়া হয়। কিন্তু প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আনারস থেকে তৈরী করা যায় মজাদার জ্যাম, জেলী, জুস ও আচার। এ ছাড়া আনারস স্লাইস করে কেটেও সংরক্ষণ করা যায়। আমাদের দেশের বড় বড় বিপণী বিতানগুলোতে এ সকল পণ্য সারা বছর পাওয়া গেলেও সবই বিদেশী। কাজেই দেশীয় ভাবে আনারস থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এ সমস্ত খাদ্য সামগ্রী তৈরী করে সুন্দর মোড়কীকরণের মাধ্যমে বিপণন করলে আয় বহুগুনে বৃদ্ধি করা যায়। বাজারজাতকরণের এ কৌশল সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে বিশেষ করে মহিলাদেরকে অবহিত করা গেলে কৃষকগণ আর্থিকভাবে বেশী লাভবান হবেন তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

আনারস বাজারজাতকরণে সরকারী কার্যক্রম :

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সব সময়ই কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি কিভাবে নিশ্চিত করা যায় তার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ আয়োজন করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করে মহিলা, কৃষক ও উদ্যোক্তাগণকে আনারসসহ বিভিন্ন ফল ও শাক-সব্জীর বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পোষ্ট হারভেস্ট টেকনোলজি ডিভিশন থেকে বাজারজাতকরণের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

কলা কর্তনোত্তর পরিচর্যা ও বাজারজাতকরণ।

কলা আমাদের দেশে অত্যন্ত পরিচিত ও পুষ্টিকর জনপ্রিয় একটি ফল। সারা বছরই এ ফলটি পাওয়া যায়। বাংলাদেশে রয়েছে বিভিন্ন জাতের কলা। তন্মধ্যে সবরী, চম্পা ও সাগর উল্লেখযোগ্য। উৎপাদন পর্যাপ্ত হলেও কর্তনোত্তর পরিচর্যার অভাবে এ ফলটির অপচয় খুবই বেশী। এতে একদিকে যেমন কৃষকের শ্রম নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই ঠিকমত কর্তনোত্তর পরিচর্যা নিলে কৃষকগণ নিশ্চিতভাবেই লাভবান হতে পারেন।

কলা বাজারজাতকরণে কর্তনোত্তর পরিচর্যাঃ

কলা বাজারজাতকরণে কর্তনোত্তর পরিচর্যা বলতে বুঝায় পরিপক্ক কলা গাছ থেকে সংগ্রহ করার পর সার্বিকভাবে-এর যত্ন নেয়া। বিক্রির পূর্ব পর্যন্ত এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এজন্য যত্নসহকারে কলার কাঁদি সংগ্রহ ও পরিবহন করতে হবে যাতে কলার গায়ে কোন রকম আচর বা আঘাৎ না লাগে বা থেতলিয়ে না যায়। যদি কোন কারণে কলার গায়ে কাঁচির আঘাৎ লাগে তবে তা সংগ্রহের পর পৃথক করে নিতে হবে। এরপর কলা স্বাভাবিক নিয়মে পাঁকাতে হবে। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন রকম বিষাক্ত ক্যামিকেল মেশানো উচিৎ নয়। কলার বিকৃতি বা অপচয় রোধ এবং এর গুনগতমান রক্ষা করে বাজারজাতকরণ করলে নিশ্চিতভাবেই লাভবান হওয়া সম্ভব।

বাজারজাতকরনে প্যাকেজিং ও পরিবহনঃ

প্যাকেজিং-এর উদ্দেশ্য হলো পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য পণ্য সামগ্রীর বিকৃতি বা অপচয় রোধ করে পণ্যের গুনগতমান রক্ষা করা। পণ্য বাজারজাতকরণে প্যাকেজিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে কলা বাজারজাতকরণে সাধারণতঃ মান সম্পন্ন কোন প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহৃত হয় না। এতে পরিবহণের সময়

আঘাৎ প্রাপ্ত হয়ে কলার গুনগতমান নষ্ট হয় অথবা পঁচে যায়। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পরিবহণের সময় একটু বেশী যত্নশীল ও কৌশল অবলম্বন করলে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা তুলনামুলকভাবে বেশী লাভবান হতে পারবেন। মনে রাখতে হবে যথাযথ প্যাকেজিং পণ্যের কর্তনোত্তর ক্ষতি অনেক কমিয়ে দেয় এবং অধিক মুনাফা লাভে সহায়ক ভুমিকা রাখে।

সংগ্রহোত্তর কলার পরিচর্যাঃ

কৃষক ও ব্যবসায়ীরা এক্ষেত্রে যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করলে লাভবান হতে পারেন তা হলোঃ

- গাছ থেকে কলা সংগ্রহের পর যথা সম্ভব যত্নসহকারে হ্যান্ডেলিং করতে হবে যাতে কলা আঘাৎ প্রাপ্ত না হয়;
- গাছ থেকে কলা সংগ্রহের পর হালকা গরম পানি দিয়ে মুছে দিলে ভাল হয়;
- কাঁদি থেকে কলা কেটে অবশ্যই গ্রেডিং করে নিতে হবে। কারণ কাঁদির উপরের দিকের কলাগুলো একটু বড় হয় এবং নীচের দিকের কলাগুলো ছোট হয়;
- বাতাস চলাচল করতে পারে এমন ছিদ্রযুক্ত কাগজের বা কাঠের বাক্সে এমনভাবে কলা সাজাতে হবে যাতে কলা বাক্সের সরাসরি সংস্পর্শে এসে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় অথবা পরিবহণের সময়ে কাঁদিগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে বাতাস চলাচল করার সুযোগ থাকে;
- পরিবহণের সময় প্যাকেটগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে নীচের স্তরগুলোর কোন ক্ষতি না হয়;
- কলা পরিবহণে বর্তমানে প্রচলিত ট্রাক ব্যবহার না করে বিশেষায়িত ট্রাক ব্যবহার করা উত্তম। ট্রাকে তাক ব্যবহার করা উচিত। এতে ট্রাকে কলাগুলো সুন্দরভাবে সাজানো থাকবে ও পরিবহনে সুবিধা হবে;
- ধারণক্ষমতার অধিক পণ্য পরিবহন করা ঠিক নয়।

  কলা বাজারজাতকরণে এ পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা হলে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা তুলনামূলকভাবে অধিক মুনাফা লাভ করবেন বলে আশা করা যায়।

কৃষিপণ্য সহজে বাজারজাতকরণের উপায়

কৃষি প্রধান একটি দেশের গ্রামীন অর্থনীতির প্রধান ধারক হলো কৃষি পণ্যের বিপণন বা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা। বাংলাদেশে কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা অতি সনাতনী এবং বহুলাংশে অনুৎপাদনশীল।

বাংলাদেশে কৃষি পণ্য কিভাবে বাজারজাতকরণ করা যায়ঃ

এই আলোচনায় প্রথমে বলা দরকার বাংলাদেশে কৃষি বাজার কত ধরনের। বাংলাদেশে প্রধানত তিন ধরনের কৃষি বাজার দেখা যায় যেমনঃ

- প্রাথমিক বাজার
- মাধ্যমিক বাজার
- প্রান্তিক বাজার

১। প্রাথমিক বাজার হলো একেবারে গ্রাম্য বাজার। যেখানে সাধারণতঃ কৃষকগণ অল্প বিস্তর জিনিষ সংগ্রহ করে খুচরা কেনা-বেচা করে থাকেন।

২। মাধ্যমিক বাজারসমূহ পাইকারী বাজারের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো উৎপাদন এলাকায় সংগ্রহকরণ বাজার হিসেবে এবং ভোগ্য এলাকায় বন্টন বাজার হিসেবে কাজ করে।

৩। প্রান্তিক বা Terminal market গুলো আভ্যন্তরীন ও রপ্তানী বাণিজ্য সংক্রান্ত কতিপয় কার্যাবলী সম্পাদন করে।

কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে উপায়ঃ

কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাতকরণ করতে হলেঃ-

- উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে হবে;
- পণ্য মান, আকার, বর্ণনা ও নমুনার ভিত্তিতে বাছাই করতে হবে;
- পাইকারী বাজারে সরবরাহ করতে হবে;
- বাজার চাহিদার দিকে নজর রাখতে হবে;
- বাজার দরসহ বাজার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;
- ফসল অপেক্ষাকৃত সহনীয়ভাবে প্যাকিং করতে হবে;
- ভালভাবে পরিবহন করতে হবে যেন-পণ্যের গুনগতমান ও রং ক্ষতিগ্রস্থ না হয়;
- বাজারে অযাচিত হয়রানী/ঝুকি হ্রাস করতে হবে;
- বিপণন ব্যয় কম রাখা, অর্থাৎ কৃষক বান্ধব পরিবেশ থাকতে হবে;
- উন্নত ওজন মাপ পদ্ধতি অনুসরণ করা;
- পণ্য সংরক্ষণের ভাল ব্যবস্থা থাকা।

কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাঃ

কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনে কখনই ধারাবাহিকতা থাকে না। কখনো প্রচুর উৎপাদন হয় আবার কখনো নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ছাড়াও নানাবিধ সমস্যা রয়েছে যেমনঃ

- কৃষিজাত পণ্যের প্রধান বাজারজাতকরণে সমস্যা হলো ভোক্তাদের চাহিদা পূর্বানূধাবন করতে না পারা। যেমনঃ ভোক্তা যে পণ্য চায় সেটি উৎপাদন না করে অন্যটি উৎপাদন বেশী করা;
- কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণের আর একটি মৌলিক সমস্যা হলো কৃষকরা তাদের কষ্টে উৎপাদিত পণ্য চাহিদামত উচ্চমূল্যে বিক্রি করতে পারেন না। এর প্রধান কারণ গুলো হলোঃ-

- আর্থিক সমস্যা কৃষকের ফসল বাজারজাতকরণে অন্যতম সমস্যার একটি। কারণ কৃষকেরা অভাব তাড়িত হয়ে গ্রাম্য বাজারে অনিচ্ছাকৃত বাজার দরে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয়;
- বাজার তথ্যের অভাব। সঠিক বাজার তথ্য না থাকায় বাজারের প্রচলিত দামে তাকে পণ্য বিক্রি করতে হয়;
- অপর্যাপ্ত ও অদক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে সমস্যা;
- সুসংগঠিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে কৃষক বাধ্য হয়ে মালামাল বিক্রি করে।

কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যা সমাধানের উপায়ঃ

কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে-

- কৃষকদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি করা যেতে পারে;
- ফসল বাজারজাতকরণে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে হবে;
- মধ্যস্থ কারবারীদের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে;

- পর্যাপ্ত আধুনিক সংরক্ষণাগার বা গুদাম বা হিমাগার নির্মাণ করতে হবে;
- উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- কৃষকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে;
- সঠিক ওজন পদ্ধতি প্রবর্তন ও অনুসরণ করতে হবে।

সমস্যা সমাধানে কৃষিপণ্য বাজারজাত করণে সরকারী কার্যক্রমঃ

কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে সরকারীভাবে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট ও ঢাকার গাবতলীতে ১টি সেন্ট্রাল মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে সরাসরি কৃষকের পণ্য বিক্রির সুযোগ রাখা হয়েছে;
- এছাড়া প্রায় ৫০০টি ফার্মার্স মার্কেটিং গ্রুপ বা বাজারজাতকরণ দল গঠন করা হয়েছে। যেখানে কৃষকরা দলবদ্ধ হয়ে তাদের ফসল বিক্রির সুযোগ পাবে।
- ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটে মালামাল আনা নেয়ার জন্য আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন রিফার ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ব্যাপকভাবে বাজার তথ্য বা বাজার দর প্রচারের জন্য জেলা মার্কেটিং অফিসের কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। এছাড়াও নিয়মিত বাজার দর www.dam.gov.bd Website -এ প্রচার করা হচ্ছে।
- জেলা মার্কেটিং অফিসের মাধ্যমে বাজার মনিটরিংসহ সঠিক বাটখারার মাধ্যমে ওজন পদ্ধতি প্রবর্তনের কাজ চলছে।
- ফসলের বাজারজাতকরণ কৌশল সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।